

সমন্বিত গলদা চিংড়ি চাষ পদ্ধতি



ভূমিকা: প্রতিনিয়তই আমাদের দেশের আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে। বর্ধিত জনসংখ্যার বাসস্থানের প্রয়োজনেই মূলতঃ কৃষি জমির পরিমাণ কমলেও বাড়ছে মানুষের খাদ্যের চাহিদা। ফলে ব্যাপক জনগোষ্ঠির জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যের চাহিদা বর্তমান আবাদযোগ্য জমি থেকে প্রাপ্ত ফলন দ্বারা মেটানো সম্ভব হচ্ছে না। প্রথমতঃ কৃষি জমির পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে এবং দ্বিতীয়তঃ সম্পদের সঠিক ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত হচ্ছে না বিধায় কৃষকের আয় বাড়ছে না। ফলশ্রুতিতে কৃষি প্রধান আমাদের এই দেশের মোট জনসংখ্যার অধিকাংশই খাদ্যের নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে দূরাবস্থায় জীবন-যাপন করছে। এমতাবস্থায় কৃষি জমি ও সম্পদের সঠিক ও সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। আর তাই সম্পদের সঠিক ও সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে অতি অল্প সময়ে লক্ষিত জনগোষ্ঠির অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়নের উদ্দেশ্যে মৎস্য চাষ সমপ্রসারণ প্রকল্পের অধীনে পরীক্ষামূলকভাবে করা হয়েছিল নীচু ধানক্ষেতের মিঠা পানিতে "সমন্বিত চিংড়ি চাষ কার্যক্রম"। কারণ ইতিমধ্যে এই খামার পদ্ধতিটি একটি খুবই লাভজনক ব্যবসায়িক কর্মকান্ড হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।

সমন্বিত চিংড়ি চাষ অধিক আয়ের উদ্দেশ্যে একটি নির্দিষ্ট ধানের জমিকে গলদা চিংড়ি চাষের উপযোগী করে প্রস্তুত করণের পর সেখানে মিঠা পানির চিংড়ি (গলদা), সাদা মাছ, ধান ও শাক-সজি একত্রে চাষাবাদ করাই হচ্ছে "সমন্বিত চিংড়ি চাষ"। অর্থাৎ একটি জমির চারপাশে উঁচু আইল তৈরী করে আইলের ভিতরের দিকে ক্যানেল বা ড্রেনের মতো কেটে পানিকে দীর্ঘদিন আটকে রাখার ব্যবস্থা করে (১-দিক, ২-দিক) সেখানে গলদা চিংড়ি সাদা মাছ (সিলভার কার্প, কাতলা, বিগহেড ইত্যাদি), জমির মাঝখানের সমতল জায়গায় ধান ও আইলে শাক-সজি একত্রে চাষ করাই হচ্ছে "সমন্বিত চিংড়ি চাষ"। উল্লেখিত ফসলের মধ্যে গলদা চিংড়িই বেশী মূল্যবান তাই এই চাষ ব্যবস্থাকে "সমন্বিত চিংড়ি চাষ" বলে অভিহিত করা হয়েছে।

সমন্বিত চিংড়ি চাষের গুরুত্ব আমাদের দেশের বিভিন্ন জমিতে চাষ করা হয়। যেমনঃ যদি কোন জমিতে ধান চাষ করা হয় তবে সেখানে শাক-সজি চাষ করা হয় না বা জমিতে শাক-সজি চাষ করলে ধান চাষ করা হয় না আবার মাছ চাষের জন্য পুকুরকেই নির্বাচন করা হয়। আবার শখের বসে যদি কেই চিংড়ি চাষ করে তবে পুকুরই শেষ ভরসা। এভাবেই চলতে আমাদের বর্তমান চাষাবাদ অবস্থা। ফলশ্রুতিতে জমির সঠিক ও সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা হচ্ছে না এবং জমি থেকে প্রাপ্ত আয়ে সম্ভূত হতে পারছে না আমাদের চাষী ভাইয়েরা। এমতাবস্থায় সমন্বিত চাষের মাধ্যমে ছোট এক টুকরা জমিকেও টাকার খনিতে রূপান্তরিত করা যায়। অর্থাৎ বিভিন্ন ফসল প্রথকভাবে চাষ না করে এক টুকরা ধানের জমিতে একই সাথে গলদা চিংড়ি, মাছ, ধান ও শাক-সজির চাষ করার মাধ্যমে একদিকে যেমন জমি থেকে প্রাপ্ত আয় বৃদ্ধি পায় অপরদিকে চাষাবাদের ঝুঁকি/ক্ষতির সম্ভাবনা কমে যায়। নিম্নে একর প্রতি (১০০ শতাংশ) জমির বাৎসরিক আয়ের তুলনামূলক তথ্য প্রদান করা হলোঃ

ক্রমিক নং	ফসল	একক চাষ	সমন্বিত চাষ
১.	ধান	১০,০০০	১০,০০০
২.	চিংড়ি (মিঠা পানির)	-	৬০,০০০
৩.	মাছ	-	৮০০০
৪.	শাক-সজি	-	২০০০
	মোট	১০,০০০ (সর্বোচ্চ)	৮০,০০০(মূল্যতম)

সমন্বিত গলদা চিংড়ি চাষ পদ্ধতি সমন্বিত চিংড়ি চাষ পদ্ধতি হচ্ছে ধারাবাহিক কার্যক্রমের সমন্বয়। অর্থাৎ কাংখিত ফল পেতে হলে এই চাষাবাদ ব্যবস্থার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কিছু পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সামান্য অবহেলা আপনাকে অনেক লাভ থেকে বঞ্চিত করতে পারে। বাংলাদেশের দক্ষিণ- পশ্চিমাঞ্চলের খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার চাষী ভাইয়েরা সমন্বিত চিংড়ি চাষ পদ্ধতির প্রতিটি পদক্ষেপ অত্যন্ত গুরুত্ব ও যত্নের সহিত পালন করে এবং পরিশ্রমের মাধ্যমে তাদের অতীত দূরাবস্থার থেকে অতি অল্প সময়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে ভালো অবস্থায় আসতে পেরেছে। আর এতে এটি প্রমাণিত হয় যে, পরিশ্রম করলে অবশ্যই সফলতা আসে।

সমন্বিত চিংড়ি চাষ পদ্ধতির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যে সমস্ত পদক্ষেপগুলো নিতে হবে তা হলোঃ

১. জমি নির্বাচন ও অবকাঠামো তৈরী।

২. জমি প্রস্তুতকরণ / উপযোগীকরণ।

♥ মজুদ পূর্ব ব্যবস্থা

♥ মজুদকালীন ব্যবস্থা

♥ মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থা

৪. নার্সারী পুকুর থেকে জুভেনাইল (ছাটি) মূল জমিতে মজুদ, নিয়মিত খাদ্য প্রয়োগ ও যত্ন নেয়া।
৫. চিংড়ির সাথে অন্যান্য মাছের মিশ্রচাষ।
৬. আইলে শাক-সজি চাষ।
৭. নিয়মিত (মাসে দু'বার) চিংড়ির নমুনা পর্যবেক্ষণ।
৮. চিংড়ি আহোরণ ও বাজারজাতকরণ।
৯. চিংড়ি রোগ ব্যবস্থাপনা (সম্ভাব্য)।

জমি নির্বাচন ও অবকাঠামো তৈরী

জমি নির্বাচনঃ

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, সমন্বিত চিংড়ি চাষ ব্যবস্থাপনায় ধানের সাথে গলদা চিংড়ি, মাছ (সিলভার, কাতলা) ও শাক-সজি একত্রে চাষ করা হয়। কিন্তু সব জমিই এই চাষাবাদ ব্যবস্থার জন্য উপযুক্ত নয়। যেমনঃ উঁচু জমি বা যে জমিতে বালি মাটির পরিমাণ বেশী সে জমিতে পানি ধরে রাখা যাবে না তাই চিংড়ি ও সাদা মাছ চাষ করা যাবে না এবং সমন্বিত চাষ হবে না। তাই প্রথমে জমি নির্বাচন একান্ত জরুরী।

উপযুক্ত জমির বৈশিষ্ট্যঃ

জলাবদ্ধ নিচু জমি বা ধান ক্ষেত।

যেখানে ৭-১০ মাস বৃষ্টির পানি ধরে রাখা যায়।

যেখানে কাঁদা মাটির পরিমাণ বেশী।

বসত বাড়ির নিকটস্থ জমি।

অবকাঠামো তৈরীঃ

জমি নির্বাচনের পর নির্বাচিত জমিতে সমন্বিত চিংড়ি চাষের উপযোগী অবকাঠামো তৈরী করতে হবে। যেন জমির প্রতিটি অংশই সঠিকভাবে ব্যবহার করা যায়।

অবকাঠামো তৈরীর ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণঃ

(ক) আইল তৈরীঃ জমির পার্শ্ব পর্যাপ্ত উঁচু (বর্ষাকালে জমিতে আটকে থাকা পানির লেভেল থেকে ১ হাত উঁচু) ও মোটা/চওড়া (উপরে ২ ফুট নীচে ৩ ফুট) আইল তৈরী করে- নিম্নোক্ত সুবিধা অর্জন করা যায়ঃ

জমিতে পানি ধরে রাখা যায়।

চিংড়ি বা মাছ অন্য জমিতে যেতে পারে না।

বাইরের পঁচা ও নোংরা পানি ভিতরে ঢুকবে না।

আইলে শাক-সজি চাষ করে পারিবারিক চাহিদা মেটানো ও অর্থ উপার্জন করা যায়।

(খ) ক্যানেল/ড্রেনঃ জমিতে আইলের ভিতরের দিকে আইল থেকে ৩-৪ ফুট জায়গা (বকচর) ছেড়ে দিয়ে ক্যানেল বা ড্রেন (৭-১০ ফুট চওড়া ও ৩-৫ ফুট গভীরতা) তৈরী করে- নিম্নোক্ত সুবিধাগুলো নিশ্চিত করতে হবে-

চিংড়ি ও মাছের আশ্রয়স্থল হিবেবে কাজ করবে।

সূর্যের তাপে পানি গরম হলে ক্যানেলের ঠান্ডা পানিতে আশ্রয় নিবে।

শুকনা মৌসুমে জমিতে পানি ধরে রাখা যাবে।

চিংড়ির খাদ্য প্রয়োগের স্থান হিসেবে ব্যবহার করা হবে।

উল্লেখ্য জমির আয়তন ও চাষীর সামর্থ্য অনুযায়ী জমির ক্যানেল তৈরী করতে হবে। জমি বড় হলে কমপক্ষে ৩ দিকে ক্যানেল এবং ছোট হলে ২ দিকে ক্যানেল কাটতে হবে।

জমিতে একটু বেশী চওড়া করে ১০-১ ফুট ক্যানেল কাটলে একদিকে হলেও চলবে।

(গ) নার্সারী পুকুরঃ অন্যান্য মাছের রেপূর মত চিংড়ির রেপূর প্রথমেই চাষের জায়গায় ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। কারণ এতে চিংড়ির রেপূর বেশী পরিমাণ মারা যায়। তাই রেপূরকে বাঁচানোর জন্য অবকাঠামো তৈরীর সময়ই নির্বাচিত জমির যে কোন এক পার্শ্ব প্রথম একটি জায়গা তৈরী করতে হবে যেখানে ৩০-৩৫ দিন রেপূরকে প্রথকভাবে যত্ন নেয়া যায়। রেপূরকে প্রথকভাবে যত্ন নেয়া যায়। রেপূরকে প্রথকভাবে রাখার এই জায়গাকেই নার্সারী পুকুর বলে। নার্সারী পুকুর সাধারণতঃ ছোট হলেই ভালো এবং জমির পরিমাণও সম্ভাব্য চিংড়ি মজুদ সংখ্যার উপর পুকুরের আকার নির্ভর করে। তবে সাধারণতঃ ৩ শতাংশ থেকে ১০ শতাংশ এবং ৩-৫ ফুট গভীরতাই উত্তম।

জমির প্রস্তুতকরণ

সমন্বিত চাষের জমি প্রস্তুত করা হলো- ধান বা অন্য ফসল উৎপাদনের জন্য জমি তৈরী করা মতো। জমিতে ভাল ফসল পাবার জন্য যেমন আইল ঠিক করা, চাষ দেয়া, আগাছা পরিষ্কার করা, সার প্রয়োগ এবং আনুসঙ্গিক কাজ করে চারা রোপন করতে হয় তেমনই চিংড়ি চাষের জমিতে পোনা ছাড়ার পূর্বে আনুসঙ্গিক কতগুলো কাজ করতে হয়। এতে করে পোনা উপযুক্ত পরিবেশ পায়। ফলশ্রুতিতে ভাল উৎপাদন পাওয়া যায়। তাছাড়াও চিংড়ি চাষে ভবিষ্যতের সমস্যাসমূহ যেমনঃ পানিতে দূষিত গ্যাস সৃষ্টি, চিংড়ির রোগ ইত্যাদির হাত হতে চিংড়িকে রক্ষা করতে চিংড়ি চাষের নির্ধারিত পুট/জমিকে প্রস্তুত করা একান্ত জরুরী। সুতরাং জমি প্রস্তুতের মাধ্যমে নির্ধারিত পুট/জমিকে চিংড়ি পোনা মজুদের উপযোগী করে তোলা অর্থাৎ তাদের জন্য একটা সুস্থ-সবল পরিবেশ তৈরী করে দেয়া হয়।

ঘের বা খামার প্রস্তুত করার সময় কতগুলো পদক্ষেপ বা ধাপ অনুসরণ করতে হয়, সেগুলো হলোঃ ঘেরের পাড় মেরামত করা

পর্যাপ্ত সূর্যের আলো নিশ্চিত করা ও আগাছা অপসারণ

পেরী বা কাঁদা উঠিয়ে ফেলা

রাঙ্কুসে এবং অবাঞ্ছিত মাছ অপসারণ করা

চুন প্রয়োগ করা

সার প্রয়োগ করা

সার প্রয়োগ করা

পানিতে প্রাকৃতিক খাদ্যের উপস্থিতি ও পোনা ছাড়ার উপযোগ্যতা যাচাই

পাড় মেরামত করাঃ জমির পাড়ে যাতে এমন কোন বড় গাছ বা অন্য কিছু না থাকে যাতে পানিতে পর্যাপ্ত সূর্যের আলো পড়তে অসুবিধা হয়। তাছাড়া ঘেরের ঢাল বা পাড়ে অনাকাঙ্ক্ষিত আগাছা থাকলে, পাড়ে গর্ত থাকলে, বিভিন্ন ধরনের রাঙ্কুসে প্রাণী লুকাতে পারে যারা পোনা খেয়ে ফেলতে পারে (যেমনঃ সাপ, উদ, বেজী ইত্যাদি)। তাছাড়া পাড় যাতে ভাঙ্গা না থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে বন্যার পানি বা পাশব্ৰবর্তী জমির পানি অনুপ্রবেশ জনিত অসুবিধার সৃষ্টি না হতে পারে। ঘের তৈরীর সময় ঘের পানি আসা-

যাওয়া নিশ্চিত করতে হবে। কারণ পানি আসা-যাওয়ার সাথে ঘেরের পানির গুণাগুণ নির্ভর করে।

পর্যাণ্ড সূর্যের আলো নিশ্চিত করা ও আগাছা অপসারণঃ জমিতে অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের অপ্রয়োজনীয় ও অতিরিক্ত জলজ উদ্ভিদ জন্মাতে পারে যা ডুবন্ত বা ভাসমান বা অর্ধ ডুবন্ত যারা পানি থেকে পুষ্টি গ্রহণ করে খাদ্য উপাদান কমিয়ে ফেলে এবং এরা পর্যাণ্ড সূর্যের আলো প্রবেশ করতে দেয় না এবং রাতে পানি হতে অক্সিজেন গ্রহণ করার ফলে অক্সিজেন স্বল্পতা দেখা দেয় তাছাড়াও সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরী প্রক্রিয়া ব্যহত করে ও আগাছা পচনের বিষাক্ত গ্যাস তৈরী করতে পারে ফলে জমি চিংড়ি চাষের অনুপযোগী হয়ে যায়। তাই জমি প্রস্তুতের সময় এবং পরবর্তী সব সময় এগুলো অপসারণ করতে হবে।

পেরী বা কাঁদা উঠিয়ে ফেলা (মাছ/চিংড়ি চাষকৃত পুরাতন জমি): চিংড়ি ও মাছের উৎপাদনের জন্য চিংড়ি চাষীরা প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন প্রকার খাবার দিয়ে থাকে। এদের সবটাই চিংড়ি বা সাদা মাছ গ্রহণ করে না। ফলে অবশিষ্টাংশ পঁচে পানির তলায় জমা হয়। এছাড়া বিভিন্ন জলজ উদ্ভিদ মরে পচে মাটিতে মিশে এবং ঘেরের পাড়ের মাটি তলায় জমে জুড়ুর কাঁদার সৃষ্টি করে থাকে। এসব থেকে বিভিন্ন প্রকার গ্যাস সৃষ্টি হয় এবং এতে পানির গুণাগুণ নষ্ট হয়। চিংড়ি এবং সাদা মাছের উৎপাদন ব্যাহত হয়। তাই চিংড়ি চাষের জমি তৈরীর সময় অতিরিক্ত কাঁদা তুলে ফেলতে হয়। উল্লেখ্য নতুন চিংড়ি চাষের জমি হতে প্রথম ৩ বৎসর কাঁদা অপসারণের প্রয়োজন নেই।

রাস্কুসে এবং অবাঞ্ছিত মাছ অপসারণ করাঃ চিংড়ি খামারে পোনা মজুদের পূর্বেই নিশ্চিত করতে হবে যে, খামারে রাস্কুসে এবং অবাঞ্ছিত প্রজাতির মাছ নেই। আর রাস্কুসে এবং অবাঞ্ছিত মাছ থাকলে ঘের ব্যবস্থাপনা ভালো হবে না। কারণ রাস্কুসে প্রজাতির (যেমনঃ বোয়াল, শোল, টাকী, কই, আইর, কাকিলা, চিতল ইত্যাদি) মাংস ভোজী বিষয়ী এরা অন্য সকল প্রজাতি ভক্ষণ করে। তাছাড়া অবাঞ্ছিত প্রজাতি (যেমনঃ মলা, ঢেলা, পুটি ইত্যাদি) এরা রাস্কুসে নয় কিন্তু চাষযোগ্য পোনার খাবার এবং অক্সিজেন এ ভাগ বসায়।

তাছাড়া আমাদের দেশের চিংড়ি চাষীরা পূর্ববর্তী বছরের চিংড়ি রেখে দেন পরবর্তী বছর ভালো বাজার পাবার আশায় কিন্তু গলদা চিংড়ি স্বজাতিভোজী তাই সুযোগ পেলে তারা পরবর্তী বছরের রেণু পোনা খেয়ে ফেলে। এজন্য পূর্ববর্তী পোনা না রাখাই ভালো।

রাস্কুসে এবং অবাঞ্ছিত প্রজাতি অপসারণের ক্ষেত্রে চাষীদের আর্থিক ক্ষমতা ও প্রাকৃতিক উৎপাদনশীলতা বিবেচনা করে।

নিম্নোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারেঃ (ক) বারবার জাল টেনে-এতে রাস্কুসে এবং অবাঞ্ছিত মাছ অপসারণ করা সম্ভব।

(খ) ঘেরের পানি শুকনো- ২/৩ বছর পর পর ঘেরের পানি শুকালে ভাল হবে।

তবে সে ক্ষেত্রে পানির উৎস বিবেচনায় রাখতে হবে।

চিংড়ি চাষের জমি শুকানোর সুবিধাঃ অতিরিক্ত কাঁদা বা তলানী দূর করা

রাস্কুসে বা অবাঞ্ছিত মাছ অপসারিত করা

সূর্যের তাপে ঘেরের তলদেশের মাটি পুষ্টি সমৃদ্ধ হয়

তলার মাটির বিষাক্ত গ্যাস দূরীভূত হয়, তবে বিবেচনা করতে হবে পুনরায় পর্যাণ্ড পানির ব্যবস্থা করা যাবে কিনা।

যদি উপরের পদ্ধতিগুলি প্রয়োগ করা সম্ভব না হয় সে ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত হারে রোটেনন প্রয়োগ করা যেতে পারে। (গ) রোটেনন প্রয়োগঃ

প্রয়োগ মাত্রা	আয়তন	গভীরতা	শক্তি	বিষাক্ততার মেয়াদ
১৮-২০ গ্রাম	প্রতি শতক	প্রতি ফুট পানির জন্য	৯.১	৭-১০ দিন
২০-২৫ গ্রাম	প্রতি শতক	ই	৭%	ই

চুন প্রয়োগ করাঃ চিংড়ি ও মাছ চাষের ক্ষেত্রে চুনের ব্যবহার হলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এক্ষেত্রে চুনের গুনের শেষ নেই। যেমনঃ

চুন ব্যবহার মাটি ও পানির ক্ষতির রোগজীবাণু ধ্বংস হয়।

চুন প্রয়োগে (চুনে ক্যালসিয়াম থাকে) মাছ ও চিংড়ির দৈহিক বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

চুন নিয়মিত ব্যবহারে রোগ প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করে।

চুন প্রয়োগে পানির ঘোলাটে ভাব দূর হয়ে পানির ভিতরে সূর্যের আলো প্রবেশে সহযোগিতা করে ও প্রকৃতিক খাদ্য তৈরীর প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে।

চুন সারের কার্যকারিতাকে বৃদ্ধি করে।

পানিতে থাকা ব্যাকটেরিয়া পানিতে থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করায় চিংড়ির অক্সিজেনের অভাব হয়। চুন প্রয়োগ করলে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ব্যাকটেরিয়াগুলো নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে ফলে তাদের অক্সিজেন ব্যবহার কমে যায়।

প্রয়োগ মাত্রাঃ চুন প্রয়োগ মূলত নির্ভর করে জমির মাটির গুণাগুণের উপর। চিংড়ি চাষের জমি তৈরীর সময় পাথুরে চুন শতাংশে ১ কেজি হারে ব্যবহার করা উত্তম।

ব্যবহার পদ্ধতিঃ

শুকনা জমির জন্যঃ জমিতে যখন পানি থাকে না অর্থাৎ শুকনা জমিতে পাথুরে চুন গুড়া করে জমিতে ছিটিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।

পানি থাকা অবস্থায়ঃ চাউঁ বা মাটির গর্তে পরিমানমত চুন ৮-১০ (প্রয়োজনে ৩-৪ ঘন্টা পরে ও ব্যবহার করা যায়।) ঘন্টা পূর্বে ভিজিয়ে গুলিয়ে নিতে হবে। উক্ত চুন ঘেরের পানিতে বা শুকনো ঘেরের চাতাল ও পাড়ের মাঝের খালে ও ঢালে ছিটিয়ে দিতে হবে।

সার প্রয়োগ করাঃ চুন প্রয়োগের অন্তত ৫-৭ দিন পর জমিতে তলার প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদনের জন্য জৈব সার বা কম্পোষ্ট সার বা সবুজ সার বা প্রয়োজনে অজৈব সার ব্যবহার করা যেতে পারে। জৈব সার হিসেবে হাঁস-মুরগীর বিষ্ঠা, পানিতে সরাসরি না দিয়ে অন্ততঃ ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে তারপর প্রয়োগ করা উত্তম। তবে শুকনা জমিতে সরাসরি প্রয়োগে ভালো ফল পাওয়া যায়।

চিংড়ি চাষের জমি তৈরীর সময় নিম্নোক্ত হারে সার প্রয়োগ করা যেতে পারেঃ

প্রতি শতাংশে- পানিতে প্রয়োগের ক্ষেত্রে	প্রতি শতাংশে- পানিতে প্রয়োগের ক্ষেত্রে
গোবর / কম্পোস্টঃ ৩-৫ কেজি বা	গোবরঃ ৩০-৪০ কেজি
হাঁস-মুরগীর বিটাঃ ২-২.৫০ কেজি	হাঁস-মুরগীর বিটাঃ ১৫-২০ কেজি

ইউরিয়াঃ ১০০ গ্রাম চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে খুব একটা প্রয়োজন্য নয়।

টিএসপিঃ ১০০ গ্রাম

বিঃ দ্রঃ এখানে মনে রাখা দরকার যে, সার প্রয়োগের মাত্রা সব সময় ঠিক থাকবে না। অবস্থা ভেদে এর পরিবর্তন করতে হতে পারে।

পানিতে প্রাকৃতিক খাদ্যের উপস্থিতি ও পোশা ছাড়ার উপযোগ্যতা যাচাইঃ

সার প্রয়োগের সময় পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরী হয়। পানিতে আনুবিষ্কণীক ও দৃশ্যমান বিভিন্ন প্রকার শেওলা ও প্রণী কনাই হলো প্রাকৃতিক খাদ্য। প্রাকৃতিক খাদ্যে চিংড়ির স্বাস্থ্য বৃদ্ধির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পুকুরের পানির রং দেখেও পানিতে প্রাকৃতিক খাদ্যের উপস্থিতি বুঝা যায়। প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরীর জন্য আলো, তাপ, পুষ্টি পদার্থ ও অনুকূল পরিবেশের প্রয়োজন হয়। পরিবেশের তারতম্যের জন্য এই প্রাকৃতিক খাদ্যের উৎপাদনেও হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে।

প্রাকৃতিক খাদ্যের সঠিক মাত্রা নিপুণ করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। সার প্রয়োগের ৫-৭ দিনের মধ্যে পানিতে খাবার তৈরী হয়েছে কিনা তা বুঝা যাবে। পানির রঙ হালকা সবুজ, লালচে ও বাদামী সবুজ হলে বুঝতে হবে খাদ্য তৈরী হয়েছে। তাছাড়া প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরী হয়েছে কিনা তা বুঝা যাবে-

সেকী ডিস্ক ব্যবহার করে

স্বচ্ছ কাঁচের গ্লাস ব্যবহার করে

হাত দিয়ে

সেকী ডিস্ক পদ্ধতিঃ

সেকী ডিস্ক পানিতে ডুবানোর পর-

লাল সুতা পর্যন্ত	বেশী খাদ্য	সার দিতে হবে না, পোশা ছাড়ানো যাবে না
সবুজ সুতা পর্যন্ত	ভালো খাদ্য	পোশা ছাড়ানো যাবে, নিয়মিত সার দিতে হবে
সাদা সুতা পর্যন্ত	খাদ্য নেই	সারের মাত্রা বাড়িয়ে দিতে হবে

হাতের তালু পদ্ধতিঃ সূর্যের আলোয় আলোকিত দিনের ১০-১১ টায় হাতের কনুই পর্যন্ত পুকুরের পানিতে ডুবিয়ে হাতের তালু / পাতা যদি দেখা না যায় তবে বুঝতে হবে পরিমিত প্রাকৃতিক খাদ্য নেই এবং নিয়মিত সার দিতে হবে। অর্থাৎ হাতের তালু না দেখা গেলে বুঝতে হবে পানিতে প্রাকৃতিক খাদ্য আছে। স্বচ্ছ কাঁচের গ্লাসে পানি নিয়েও এ কাজ করা যায়।

গলদা চিংড়ির রেণু মজুদ উল্লেখিত চিংড়ি চাষের জমি প্রস্তুতের ধাপগুলো অনুসরণ করে জমি প্রস্তুত করার পর গলদা চিংড়ির রেণু মজুদের ব্যবস্থা করতে হবে। সমন্বিত চিংড়ি চাষের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যতগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়, তার মধ্যে নাসরী পুকুরে রেণু মজুদ ও এর ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ রেণু পর্যায়ের এর ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে বেশী। সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে চিংড়ির রেণু মজুদের পর ৩০-৪৫ দিন বেশেভাবে যত্ন নিতে হবে, তাহলে পরবর্তীতে আর তেমন কোন ঝুঁকি থাকে না এবং রেণু মৃত্যুর হার খুব কম হয়। ফলে চাষী ভাই তার কাঙ্ক্ষিত ফল পায়। আর তাই একজন চাষী ভাইকে গলদা চিংড়ির রেণু মজুদ করার নিয়ম এবং সঠিক ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধে খুব ভালো করে জানতে হবে। এইজন্য গলদা চিংড়ির নার্সারী ব্যবস্থাপনার সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা হলোঃ

গলদা চিংড়ির নার্সারী ব্যবস্থাপনাঃ

গলদা নার্সারী কি ?

গলদা রেণু পোনা কে বলা হয় পোষ্ট লার্ভা বা পিএল। এই গলদা রেণুকে ছোট আকারের পুকুরে (জমির ভিতরে পৃথক জায়গায়) পরিকল্পিতভাবে লালন-পালন করে কিশোর চিংড়ি (জুভেনাইল বা ছাটি) উৎপন্ন করাকে গলদা নার্সারী বলে।

কেন নার্সারী করা প্রয়োজন ?

গলদা রেণুকে মানব শিশু সাথে তুলনা করা যেতে পারে। মানব শিশুর (অবুঝ) যাতে ক্ষতি না হয় সেজন্য যেমন আমরা বিশেষ ব্যবস্থা নিয়ে থাকি যাতে সে বেড়ে উঠতে পারে সেরূপ রেণুর ক্ষেত্রেও বেশে যত্নের প্রয়োজন। কারণ রেণু পর্যায়ের এরা থাকে দুর্বল এবং অসহায়। তার উপর পরিবহনের ফলে সে আরও দুর্বল হয়ে পড়ে। তাছাড়া রেণু পর্যায়ের সাপ, ব্যাঙ, হাঁসপোকা, রাক্ষুসে মাছ ইত্যাদির হাত থেকে বাঁচার ক্ষমতা তার থাকে না। সে কারণে অপরিপক্বিতভাবে অনেক বড় জায়গায় রেণু মজুদ করলে ৫০-৬০ ভাগ রেণু মরে যেতে পারে বলে কৃষক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। তাই রেণু মজুদের গুরুত্বপূর্ণ এবং এত রেণুর মৃত্যুর অনেকেই কমে যায়।

গলদা চিংড়ির নার্সারী ব্যবস্থাপনার ধাপঃ

ক. মজুদ পূর্ব ব্যবস্থাপনাঃ

নার্সারীর আকারঃ নার্সারী পুকুরের আকার ৫-১০ শতাংশের মধ্যে হওয়া ভালো। এক্ষেত্রে ধান ক্ষেতের ১ টি ক্যানেল বা গর্ত ব্যবহার করা যেতে পারে।

গভীরতাঃ নার্সারী পুকুরের গভীরতা ৩-৪ ফুট এর মধ্যে হলে ভালো কারণ এতে পর্যাপ্ত সূর্যের আলো পড়ে ও অক্সিজেনের ঘাটতি থাকে না।

নার্সারী পুকুরের তলদেশঃ গলদা চিংড়ির নার্সারীর ক্ষেত্রে পানি অপসারণ করে পুকুরের তলদেশ ভালোভাবে শুকিয়ে নিতে হবে এবং আগাছা দূর করতে হবে।

চুন প্রয়োগঃ শতাংশে ১ কেজি হারে পাথুরে চুন প্রয়োগ করতে হবে। পুকুর শুকালে চুন গুড়া করে সরাসরি এবং পানি থাকলে পানিতে গুলিয়ে ছিটকে দিতে হবে।

প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরীঃ চুন প্রয়োগের ৩-৫ দিন পরে শুধুমাত্র গোবর প্রতি শতাংশে ৩-৫ কেজি পানিতে গুলিয়ে ছিটকে দিতে হবে।

জলজ পোকামাকড় দমনঃ জলজ পোকা যেমনঃ হাঁস পোকা ছোট রেণুর ক্ষতি করে। তাই রেণু ছাড়ার আগের দিন প্রতি শতাংশে ১২৫ মি.লি. ডিজেল বা কেরোসিন পানির উপর ছড়িয়ে দিলে ৪-৬ ঘণ্টার মধ্যে হাঁস পোকা সহ অন্যান্য পোকা মারা যায়। পরে চট জাল বা কাপড় দিয়ে কেরোসিনসহ পোকা তুলে ফেলতে হবে। পোকা মাকড় দমনের ক্ষেত্রে কোন কীটনাশক অবশ্যই ব্যবহার করা যাবে না।

চিংড়ির আশ্রয়স্থল স্থাপনঃ চিংড়ির নার্সারীতে আশ্রয়স্থলের ব্যবস্থা করতে হবে। রেণু বাঁচার হার অনেকাংশে নির্ভর করে নার্সারীতে স্থাপিত আশ্রয়স্থলের উপর। চিংড়ির বৃদ্ধি খোলস বদলানোর মাধ্যমে হয়ে থাকে। খোলস বদলানোর সময় চিংড়ি দুর্বল থাকে। চিংড়ির একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো এরা স্বজাতিভোজী। সব চিংড়ি একসাথে খোলস বদলায় না। তাই এ সময় সবল চিংড়ি অর্থাৎ যেগুলো খোলস বদলায় না সেগুলো দুর্বল গুলোকে খেয়ে ফেলে। কাজেই এসময় দুর্বল চিংড়ির জন্য নিরাপদ আশ্রয়স্থল প্রয়োজন হয়। তাই পোণা মজুদের পূর্বে পুকুরে চিংড়ির জন্য আশ্রয়স্থলের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। আশ্রয়স্থল হিসেবে শুকনো বাঁশের শাখা-প্রশাখাসহ (ঝংলা) উপরের অংশ খুবই উপযোগী। প্রতি শতকে ১-২ টি করে বাঁশের ঝিঙা (বাঁশের শাখা প্রশাখাসহ উপরের অংশ) বা শুকানো ডাল পানিতে ডুবন্ত রাখতে হবে।

আশ্রয় ছাউনী তৈরীঃ নার্সারী পুকুরের পানি যাতে অতিরিক্ত গরম হয়ে না যায় কিংবা পানি গরম হয়ে গেলে চিংড়ির রেণু ঠান্ডা জায়গায় আশ্রয় নিতে পারে সেজন্য নার্সারী পুকুরের উপরে অর্ধেকাংশে নারিকেল পাতা দিয়ে মাচার আকারে ছাউনী দিতে হবে।

খ. মজুদকালীন ব্যবস্থাপনা-

মজুদ ঘনত্বঃ প্রতি শতাংশে ৫০০-৬০০ টি গলদা রেণু মজুদ করা যেতে পারে। যদি নার্সারীতে ১৫-২০ দিন রেণু লালনের পরিকল্পনা থাকে সে ক্ষেত্রে প্রতি শতাংশে ১০০০-২০০০ রেণু মজুদ করা যেতে পারে।

রেণু ছাড়ার সময়ঃ গলদা চিংড়ির পোনা অবশ্যই সন্ধ্যার পর মজুদ করতে হবে। তবে রাত ৮/৯টার মধ্যে মজুদ করা সবচেয়ে ভালো কারণ দিনের বেলায় পানির তাপমাত্রা দ্রুত বেড়ে যায় ফলে রেণু তার শরীরে তা অভ্যস্ত করতে পারে না। ফলে রেণু মারা যায়। কিন্তু রাতে পানির তাপমাত্রা খুব ধীর গতিতে কমতে থাকে। যা রেণুর জন্য তেমন অসুবিধা হয় না। তাই রেণু রাতেই ছাড়া উত্তম। রাতে রেণু ছাড়ার মাধ্যমে ভালো ফল পাওয়া যায় যা কৃষকের মাঠে ১০০ ভাগ পরীক্ষিত।

পোনা অভ্যস্তকরণঃ রেণুকে অবশ্যই পুকুরের পানির সাথে অভ্যস্ত করে ছাড়তে হবে। পাতিল / ব্যাগের পানির তাপমাত্রা ঐ পুকুরের পানির তাপমাত্রার সমতায় না আসা পর্যন্ত অবশ্যই অপেক্ষা করতে হবে। পাত্রের পানি আন্তে আন্তে পরিবর্তন করে পোণাসহ পাত্রটি কাচ করলে রেণু ষেচ্ছায় পানিতে বেরিয়ে যাবে। এই প্রক্রিয়া ২০-৩০ মিনিট পর্যন্ত চলতে পারে। রেণু পানিতে ছাড়ার ক্ষেত্রে কোনভাবেই তাড়াহুড়া করবেন না, পর্যাপ্ত তাপমাত্রা সঙ্গে রেণুকে খাপ খাওয়াতে হবে। কারণ রেণু বহন পাত্রে ও নার্সারী পুকুরের পানির তাপমাত্রার সমান্য পার্থক্যই রেণুর মৃত্যুর কারণ হতে পারে। তাই ছাড়ার সময় রেণু খাপ খাওয়ানোর প্রক্রিয়াকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা-

সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগঃ গলদা চিংড়ি প্রাকৃতিক খাদ্যের উপর নির্ভর করে না। তাই তাকে প্রতিদিন সম্পূরক খাদ্য দিতে হবে। পোণা মজুদের পর প্রথম ৭ দিন প্রতি ৫০০০ রেণুর জন্য একমুঠ সূজি প্রতিদিন একবার সন্ধ্যায় দিতে হবে। কারণ চিংড়ি সাধারণত রাতেই আহার করে থাকে।

পরবর্তী ২য় ও ৩য় সপ্তাহের জন্য-	১ কেজির তৈরীতে-
মাসের গুড়া / মাসের গুড়া ৪০%	⇒৪০০ গ্রাম
শৈল (সরিষা / সয়াবিন) ৪০%	⇒৪০০ গ্রাম
চিটাগড় ১০%	⇒১০০ গ্রাম
এবং গমের আটা ১০%	⇒১০০ গ্রাম

উপরোক্ত পরিমাণে বিভিন্ন উপাদান একত্রে মিশিয়ে কাই তৈরী করে ডিমের আকারে বল তৈরী করে নিতে হবে।

প্রতিটি ডিম আকারের বল প্রতিহাজার রেণুর জন্য সন্ধ্যায় দিতে হবে। প্রতিটি বল আবার চারটি ছোট বল তৈরী করে যেখানে ঝোঁপঝাড় দেয়া হয়েছে সেখানে দিতে হবে। পরবর্তী সপ্তাহ গুলোতে এই খাবারের পরিমাণ ২০% হারে বাড়তে হবে।

রেণু বেঁচে থাকা পর্যবেক্ষণঃ রেণু বা পিএল ছাড়ার পরদিন পুকুরে গামছা বা মশারীর জালের খন্ড দিয়ে পুকুরের এক কোণায় টেনে রেণুর অবস্থা দেখতে হবে, যদি প্রতি চানে ৪/৫ করে রেণু আসে তবে বুঝতে হবে বাঁচার হার খুবই ভালো। কৃষক অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, নার্সারী পুকুরে রেণু ছাড়ার পর দুইদিন টিকে গেলে পরবর্তীতে আর তেমন ঝুঁকি থাকে না।

স্বাস্থ্য ও বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণঃ রেণুর স্বাস্থ্য ভালো আছে কিনা এবং স্বাস্থ্য বৃদ্ধি হচ্ছে কিনা পরীক্ষা করতে হবে। পুকুরে গামছা বা মশারীর জালের খন্ড দিয়ে টেনে রেণুর অবস্থা দেখতে হবে, যদি রেণু গুলো খুব দ্রুত নড়াচড়া করে তবে বুঝতে হবে রেণুর স্বাস্থ্য ভাল আছে।

এভাবে ৩০-৪৫ দিনে নার্সারীতে রেণু লালন পালনের পর বড় পুকুরে/ধানক্ষেতে মজুদ করতে হবে।

গলদা রেণু চাষের গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়ঃ

- ♣ সন্ধ্যার পর রেণু মজুদ করা।
- ♣ নার্সারীতে বোঁপঝাড় (বিংলা) দেয়া।
- ♣ নিয়মিত সন্ধ্যার পর খাবার দেয়া।
- ♣ রেণু বেঁচে থাকা পর্যবেক্ষণ করা।
- ♣ নার্সারী পুকুরের যে কোন একপার্শ্বের ছায়ার ব্যবস্থা করা।

হাঁপাতে গলদা চিংড়ির রেণু লালন পালন বা হাঁপা নার্সারী

গলদা চিংড়ির রেণু লালন পালনের জন্য আরো একটি পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে। তাহলো হাঁপা নার্সারী। হাঁপা নার্সারীর যে কোন পরিষ্কার পুকুরেই স্থাপন করা যেতে পারে। অর্থাৎ ছোট নার্সারী পুকুর বা পকেট ঘের (ধান ক্ষেতের একটি ক্যানেল বা খাল) এর সুবিধা না থাকলে এ পদ্ধতিতে গলদা রেণু লালন পালন করে মজুদ পুকুর বা ধানক্ষেতে ছাড়া যেতে পারে।

হাঁপা নার্সারীর প্রয়োজনীয় উপকরণঃ প্লাস্টিক ফিল্টার নেট, নাইলন সুতা, বাঁশ, টিনের প্লেট, ঘরে তৈরী সম্পূরক খাবার, নারিকেলের/খেজুরের শুকনো ডাল-পাতাসহ অথবা বাঁশের আগালী (বিংলা)।

পদ্ধতিঃ সুস্থ ফাঁসের প্লাস্টিকের নেট দিয়ে হাঁপা তৈরী করতে হবে। হাঁপার আয়তন ২ মিঃ ২ মিঃ ১.৫০ মিঃ। এই আয়তন কম-বেশী করা যেতে পারে। এই হাঁপা যে কোন পরিষ্কার পুকুরে বাঁশের খুঁটি দিয়ে স্থাপন করতে হবে। হাঁপা নার্সারীর জন্য ঐ পুকুরে চুন, সার দেওয়ার প্রয়োজন নাই হাঁপাট পানির তলদেশে মাটি থেকে একহাত উঁচুতে স্থাপন করতে হবে এবং পানির উপরে একহাত থাকবে। গলদার রেণুর খাবার প্রয়োগের জন্য নাইলন সুতা দিয়ে টিনের প্লেট এমনভাবে ঝুলিয়ে দিতে হবে যাতে খাবারের প্লেট হাঁপার পানির মাঝ বরাবর থাকে। প্রতি হাঁপাতে ২-৪ টি প্লেট ব্যবহার করা যেতে পারে। খেজুরের শুকনো ডাল পাতাসহ প্রতিটি হাঁপাতে ২টি করে দিতে হবে। যাতে গলদার রেণুর আশ্রয়স্থলের কাজ করে এবং খেজুর পাতার ডাল সাত/আট দিন পর পর পরিবর্তন করতে হবে। এবং সাতদিন পর হাঁপাটিকে পরিষ্কার করতে হবে যেন পানিতে আটকানো শেওলা হাঁপাতে লেগে না থাকে।

খাবার প্রয়োগঃ হাঁপাতে যে টিনের প্লেট স্থাপন করা হবে তাতে খাবার দিতে হবে প্রতিদিনে মোট খাবার প্রয়োগের চারভাগের তিভাগ সন্ধ্যায় এবং একভাগ ভোরে প্রয়োগ করতে হবে।

খাবারের উপাদানঃ

ছটলী মাছের / মাংসের গুড়া-	৪০%
সরিষার খেল	৪০%
ময়দা / আটা-	২০%

উপকরণ তিনটি পানিতে মিশিয়ে ছোটবল আকারে তৈরী করতে হবে এবং এই বল রৌদ্রে ভালো কর শুকিয়ে নিতে হবে। প্রয়োগের সময় বলটি ভালো করে গুড়া কর টিনের প্লেটে দিতে হবে। এভাবে প্রতি হাজার রেণুর জন্য প্রথম সপ্তাহে ৬০ গ্রাঃ হারে, ২য় সপ্তাহে ৮০ গ্রাঃ হারে, ৩য় ও ৪র্থ সপ্তাহে ১০০ গ্রাঃ হারে দিতে হবে। ৫ম ও ৬ষ্ঠ সপ্তাহে ১২০ গ্রাঃ হারে খাবার প্রয়োগ করতে হবে। খাবার প্রয়োগের পরিমাণ টিনের প্লেটে খাবারের উপস্থিতির উপর ভিত্তি করে কমানো বাড়ানো যেতে হবে।

মজুদের পরিমাণঃ প্রতি বর্গমিটার জলায়তনে ১০০ থেকে ২০০ টি রেণু মজুদ করা যেতে পারে। মজুদের সময়কালঃ ৪০ থেকে ৪৫ দিন। হাঁপাতে লালন-পালন করে ধান ক্ষেতে বা মজুদ পুকুরে স্থানান্তর করতে হবে।

সতর্কতাঃ

১. অনেক সময় দেখা যায় কাঁকড়া হাঁপার নেট কেটে দেয় তাই সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে।
২. যেহেতু হাঁপা দীর্ঘদিন পানিতে থাকে তাই হাঁপা তৈরীতে দ্রুত পচনশীল কোন কাপড় ব্যবহার করা যাবে না।

নিয়মিত খাদ্য প্রয়োগ

নিয়মিত খাদ্য প্রয়োগঃ সমন্বিত চিংড়ি চাষের বিভিন্ন পদক্ষেপ / কার্যক্রমের মধ্যে নিয়মিত সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। কারণ অন্যান্য মাছের মত চিংড়ি পানি থেকে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাবার গ্রহণ করতে পারে না। তাই অল্প সময়ে চিংড়িকে বিক্রি উপযোগী করার জন্য নিয়মিত সম্পূরক খাদ্য অবশ্যই প্রয়োগ করতে হবে। নার্সারী পুকুর থেকে মূল জমিতে জুভেনাইল স্থানান্তরের পর থেকে চিংড়ি বিক্রির পূর্ব পর্যন্ত চিংড়িকে খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, খাদ্য প্রয়োগ ছাড়া কোনভাবেই চিংড়ি চাষকে লাভজনক করা যায় না।

সম্পূরক খাদ্যঃ

সাধারণতঃ পানিতে সার বা গোবর প্রয়োগ করলে পানিতে প্রাকৃতিক খাবার (উদ্ভিদ কণা ও প্রাণী কণা) উৎপন্ন হয় যা সিলভার কার্প, কাতলা, রুই, জাতীয় মাছ গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু চিংড়ি এই সমস্ত খাবার খেতে অভ্যস্ত নয়। তাই এদের জন্য বাইরের থেকে খাবার অবশ্যই প্রয়োগ করতে হবে। বাইরের থেকে খাবার প্রয়োগ করাকেই সম্পূরক খাবার বলে।

চিংড়ির জন্য সম্পূরক খাদ্যঃ

চিংড়িকে খাওয়ানোর জন্য বাজারের বিভিন্ন ধরনের প্যাকেটজাত খাদ্য কিনতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই খাদ্যগুলোর দাম অনেক বেশী। যেহেতু চিংড়িকে নিয়মিত খাদ্য দিতে হয় আর একজন চাষী যদি বাজার থেকে চিংড়ি খাবার কিনে খাওয়াতে চান তবে, চাষাবাদ খরচ অনেক বেড়ে যাবে। ফলে চাষীর লাভের পরিমাণ কমে যাবে। তাই বাজার থেকে খাদ্য না কিনে সহজ পদ্ধতিতে বিভিন্ন উপাদানের মাধ্যমে বাড়িতে খাদ্য তৈরী করে চিংড়িকে খাওয়ানোই উত্তম। এতে যেমন খাদ্যের পুষ্টিমাণ নিশ্চিত থাকবে তেমনি খরচও কম

(৫০%) হবে। বিভিন্ন উপাদান বিভিন্ন পরিমাণে মিশিয়ে চিংড়ির খাদ্য তৈরী করা যায়। তবে উপাদানের সহজ প্রাপ্যতা ও খাদ্যের পুষ্টিগুণ বিবেচনা করে চিংড়ির জন্য **সম্পূরক খাদ্য তৈরীর ৩টি নিয়ম এখানে উল্লেখ করা হলোঃ**

নিয়মঃ ১

উপাদানের নাম	পরিমাণ
মাংস/শুকী মাহের গুড়া	২৫%
খৈল (পরিষা/সয়াবিন)	২৫%
চাউলের কুঁড়া	২০%
আটা	২৫%
শাক-সজি	০৫%
মোট	১০০%

নিয়মঃ ২

উপাদানের নাম	পরিমাণ
মাংস/শুকী মাহের গুড়া	২৫%
খৈল (পরিষা/সয়াবিন)	২৫%
চাউলের কুঁড়া	২০%
আটা	১৫%
ভূমি	১০%
শাক-সজি	৫%
মোট	১০০%

নিয়মঃ ৩

ক্রমিক নং	উপাদানের নাম	পরিমাণ
১.	খৈল (পরিষা/সয়াবিন)	৪০%
২.	আটা/ ময়দা	১০%
৩.	চাউলের কুঁড়া	৪০%
৪.	চিটা গুড়	১০%
	মোট	১০০%

উপরোক্ত ছকে উল্লেখিত প্রথম নিয়ম অনুসরণ করে যদি ১ কেজি খাদ্য তৈরী করা হয় তবে মাংসের /শুকী মাহের গুড়া, খৈল ও আটা ৭ ময়দা সমান পরিমাণ অর্থাৎ ২৫০ গ্রাম ও ৫০ গ্রাম মিলিয়ে ১০০০ গ্রাম পূরণ করতে হবে। যদি বেশী পরিমাণ খাবার একসাথে তৈরী করা হয় তবে এভাবে সহজেই বিভিন্ন উপাদানের পরিমাণ বের করা যাবে।

খাদ্য প্রস্তুত প্রণালীঃ

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, খাদ্য উপাদানের মাধ্যমে বাড়িতে তৈরী করা উত্তম। ছকে উল্লেখিত বিভিন্ন উপাদানের পরিমাণ স্থলিত ৩টি নিয়মের যে কোন একটি বাছাই করে সে মোতাবেক উপাদানগুলো সংগ্রহ করতে হবে।

তারপর নিম্নোক্ত উপায়ে খাদ্য প্রস্তুত করতে হবে-

- ❖ খৈলগুলোকে খাবার তৈরীর একদিন আগে পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে।
- ❖ শাকসজিগুলোকে একটু হালকা সিদ্ধ করে নিতে হবে।
- ❖ এবার সবগুলো উপাদান (মাংস / মাহের গুড়া, খৈল, চালের কুঁড়া, আটা, ভূমি, শাক-সজি) একত্রে মিশিয়ে ঠিক রুটি বানানোর কাঁই এর মত তৈরী করতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যেন পানির পরিমাণ বেশী না হয়ে যায়।
- ❖ এবার মেশিন বা ছিদ্রযুক্ত টিনের খালার মাধ্যমে কাইগুলো দিয়ে সেমাই এর মত রৌ করে ১ ঘন্টা সূর্যের আলোতে শুকিয়ে নিতে হবে।
- ❖ শুকানোর পর এই পিলেটগুলোকে (সেমাইয়ের মত) হাত দিয়ে ছোট ছোট টুকরো করে প্লাস্টিক জার (বয়াম) টিন বা প্লাস্টিকের বস্তায় ভরে প্রয়োজন মত চিংড়িকে খাওয়ানো যাবে। প্রতিবার প্রস্তুতকৃত খাদ্য ১৫-২০ দিনের মধ্যে চিংড়িকে খাইয়ে ফেলাই উত্তম। অর্থাৎ প্রতিবার ১৫-২০ দিনের আন্দাজে খাদ্য তৈরী করতে হবে। এতে খাদ্যের পুষ্টিগুণ অটুট থাকবে।

খাদ্য প্রয়োগ পরিমাণঃ

চিংড়িকে তার প্রয়োজন মত খাবার দিতে হবে। কম দিলে চিংড়ির শারীরিক বৃদ্ধি ব্যাহত হবে এবং বেশী দিলে অপচয় হবে। যেহেতু চিংড়ি দিন দিন শারীরিকভাবে বড় হবে সেহেতু দিন দিন তার খাবারের পরিমাণও বাড়াতে হবে। আর এই কারণে খাদ্য প্রয়োগের পরিমাণ নির্ধারণ করা অনেকে জটিল মনে করে। কিন্তু সহজে এর পরিমাণ নির্ধারণ করা যায়। একেটি চিংড়ির ওজন যত তার ৫% বা ৫ ভাগ খাবার তাকে দিতে হবে। অর্থাৎ যদি একেটি চিংড়ির ওজন ১০০ গ্রাম হয় তবে পরিমাণ হবে ৫ গ্রাম। এভাবে হিসাব করে জমিতে আন্দাপ অনুযায়ী যতগুলো চিংড়ি আছে তাদের অদ্যের পরিমাণ নির্ধারণ করে খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে। তাই মাঝে মাঝে চিংড়ি ডুলে আন্দাপ করতে হবে। মজুদের ৮০% বাঁচার

হার ধরে খাদ্য দিতে হবে।

৪-৫ টি চিংড়ির ওজন নিয়েই বুঝতে হবে গড়ে প্রতিটি চিংড়ির ওজন কত হবে এবং জমিতে কি পরিমাণ চিংড়ি আছে তা আন্দাজ করে মোট ওজন কত হবে। সে অনুযায়ী খাবার দিতে হবে।

প্রয়োগের সময়ঃ

সাধারণতঃ চিংড়ি নিশাচর প্রাণী এবং দিনের বেলা থেকে রাতেই চিংড়ি বেশী খাবার গ্রহণ করে। তাই খাদ্যের অপচয় কমানোর জন্য প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে চিংড়িকে খাদ্য দিতে হবে। এক্ষেত্রে প্রতিদিন সন্ধ্যায় একবার খাদ্য চিংড়ি চাষের জমিতে প্রয়োগ করতে হবে।

প্রয়োগের স্থানঃ

সম্বন্ধিত চিংড়ি চাষের জমির ক্যান্ডেলে যেখানে বোঁপঝাড় (বিংলা) রাখা আছে সে জায়গাগুলোতে চিংড়ি চলাচল বেশী। তাই খাদ্য প্রয়োগের সময় এ স্থানগুলোতেই ছিটিয়ে দিতে হবে।

চিংড়ির আশ্রয়স্থল তৈরী করাঃ

গলদা চিংড়ির বৃদ্ধি খোলস পরিবর্তনের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। সকল চিংড়ি একই সময়ে খোলস পরিবর্তন করে না। খোলস পাল্টানোর পর দুই ঘন্টা পর্যন্ত চিংড়ি দুর্বল থাকে চিংড়ির একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো এরা স্বজাতীভোজী তাই এ সময়ে সবল চিংড়ি অর্থাৎ যেগুলো খোলস বদলায় না সেগুলো দুর্বল গুলোকে খেয়ে ফেলে। কাজেই এ সময় দুর্বল চিংড়ির জন্য নিরাপদ আশ্রয় স্থলের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। আশ্রয়স্থল হিসেবে শুকনা বাঁশের শাখা-প্রশাখাসহ (বাংলা) উপরের অংশ খুবই উপযোগী। প্রতি শতাংশে ১-২ টি করে বাঁশের বিংলা বা শুকনো ডাল পানিতে ডুবন্ত রাখতে হবে। চিংড়ির বাঁচার হার অনেকাংশে নির্ভর করে আশ্রয়স্থলের উপর। তাই চিংড়ির জন্য আশ্রয়স্থলের ব্যবস্থা অতীব জরুরী।

চিংড়ির সাথে অন্যান্য মাছের মিশ্রচাষ

মিশ্রচাষ কিঃ

একই জমিতে একই সময়ে একাধিক ফসল একসাথে উৎপন্ন করা যায় এবং একটি ফসল অন্যটির জন্য ক্ষতিকর নয় বরং সহায়ক তাই মিশ্র চাষ।

মিশ্রচাষের উপকারিতাঃ

একটি জমি থেকে একই সময়ে একাধিক ফসল পাওয়া যায়।

১. জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার হয়।
২. একটি আরেকটি থেকে সুবিধা পায়।
৩. অর্থনৈতিকভাবে কৃষক লাভবান হয়।
৪. মাটি ও পানির পরিবেশ ভালো থাকে।

কেন মিশ্রচাষঃ

চিংড়ির সাথে অন্যান্য কার্পজাতীয় মাছের চাষ করা চিংড়ির জন্য ভালো। কারণ ধান ক্ষেত বা পুকুর যেখানেরই চিংড়ির চাষ করা হউক না কেন সেখানে কিছু প্রাকৃতিক খাদ্য (সবুজ উদ্ভিদ ও প্রাণী কণা) জন্ম নেয় যা চিংড়ি খায় না। বরং এসব উদ্ভিদ কণিকা রাতে পানি থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে ফলে পানিতে অক্সিজেনের ঘাটতি দেখা দেয়। যা চিংড়ির জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। অনেক সময় চিংড়ি ব্যাপক হারে মারা যায়। তাই চিংড়ির সাথে কিছু সিলভার কার্প, কাতলা বা বিগহেড জাতীয় মাছ ছাড়লে এরা এই প্রাকৃতিক খাদ্য খেয়ে অক্সিজেন নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং এরা চিংড়ির সম্পূর্ণ খাবারে ভাগ বসায় না। এরা এসব প্রাকৃতিক খাবার খেয়ে চিংড়িকে বসবাসের উপযোগী করে তুলে। তাছাড়া আরা জানি চিংড়ি পানির নীচের অংশে থাকে এবং সিলভার কার্প, বিগহেড ও কাতলা মাছ পানির উপরে অংশে থাকে তাই চিংড়ির সাথে খাদ্য, আশ্রয় ইত্যাদির কোন প্রতিযোগিতা হয় না।

চিংড়ির সাথে অন্যান্য কার্প জাতীয় মাছের হিসাবঃ

নিম্নে প্রতি শতাংশ জলায়তনে চিংড়ি ও কার্প জাতীয় মাছের মজুদ ঘনত্ব বর্ণিত হলোঃ

ক্রমিক নং	মাছের নাম	পরিমাণ
১.	গলদা স্কুটেনাইল (ছাটি)	৫০-৬০টি
২.	সিলভার, বিগহেড, কাতলা	১০-১২ টি

চিংড়ির সাথে এই মাছগুলো ছাড়া অন্যান্য মাছ দেয়া যাবে না। কারণ সেগুলো চিংড়ির জন্য ক্ষতিকর।

আইলে শাক-সজি চাষ

শাক-সজি চাষের গুরুত্বঃ

আইল হলো জমির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ যা সাধারণতঃ পতিত ফেলে রাখা হয় ফলে জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত হয় না। সম্বন্ধিত চিংড়ি চাষের বিভিন্ন ফসলের মধ্যে আইলে উৎপাদিত শাক-সজি অন্যতম।

আইলে শাক-সজি চাষ করলে কৃষক অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হতে পারে এবং ঝুঁকি কমে যায়। ফলে তাকে দৃষ্টিগ্রহণ হতে হয় না। কারণ একটি ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হলেও অন্যটি দিয়ে পুষিয়ে নেয়া যায়। আইলে লতা জাতীয় গাছ যেমন- মিষ্টি কুমড়া, লাউ, শিম, চালকুমড়া, শশা, বিংগা, চিচিংগা, বাঙ্গি ইত্যাদি চাষ করলে পারিবারিক চাহিদা জুরণ করা যায় এবং বিক্রি করে লাভবান হওয়া যায়। তাছাড়া এসব লতা জাতীয় গাছ পানির উপর মাচা করে চাষ করলে প্রচণ্ড রৌদ্রে পানি সহজে গরম হয় না। ফলে চিংড়ির মৃত্যুর ঝুঁকি কমে যায়। তাছাড়া মাচা থাকার কারণে চুরি হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়। মাচা জাতীয় গাছের পাশাপাশি টেঁড়শ, পুঁইশাক, লালশাক, গিমা কলমী, চমেটো, মুলা, গাজর, ওলকপি, ডাটা, পেঁপে, বেগুন ইত্যাদি শাক-সজি চাষ করাও অধিক লাভজনক, এগুলি আইলের মাটিকে ক্ষয়রোধ থেকে সহায়তা করে। আগাছা হতে দেয় না। সাপ, ব্যাঙ ইত্যাদি আশ্রয় নিতে

পারে না।

এছাড়া কিছু কিছু সজি যেমনঃ গিমা কলমী সিদ্ধ করে চিংড়ির খাবারের সাথে মিশিয়ে চিংড়ির খাবার তৈরী করা যায় যা গুণগতমান সম্পন্ন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সমন্বিত চাষাবাদ ব্যবস্থায় যে ফসলগুলো নির্বাচন করা হয় সেগুলো একটি অপরিষ্কার জন্য উপকারী। তাছাড়া সমন্বিত চাষের মাধ্যমে জমিকে পরিকল্পিতভাবে সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে টাকার খনিতে রূপান্তরিত হয়।

গলদা চিংড়ির নমুনা পর্যবেক্ষণ

নমুনা পর্যবেক্ষণ কি?

একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর গলদা চিংড়ির বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য ইত্যাদি পরীক্ষা করার জন্য নমুনা হিসেবে কয়েকটি চিংড়ি ধরে পর্যবেক্ষণ করা বা দেখাই হচ্ছে নমুনা পর্যবেক্ষণ।

নমুনা পর্যবেক্ষণ কেন করা প্রয়োজন ?

১. শারীরিক বৃদ্ধি হচ্ছে কি-না তার জন্য নমুনা পর্যবেক্ষণ করা অতীব জরুরী।
২. চিংড়ি রোগাক্রান্ত হচ্ছে কি-না তা দেখার নমুনা পর্যবেক্ষণ।
৩. খাবার প্রায়োগের জন্য নমুনা পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন।

নমুনা পর্যবেক্ষণ কিভাবে করা যায় ?

১. ১৫ দিন পর পর বাঁকি জাল দিয়ে ৫-১০টি চিংড়ি ধরতে হবে।
২. চিংড়িগুলোকে একত্র করে ওজন নিয়ে গড় ওজন বের করতে হবে এবং তা লিখে রাখতে হবে।
৩. পরবর্তী ১৫ দিন পর ওজন নিয়ে আগের ওজনের পার্থক্য দেখে ওজন বৃদ্ধি পরীক্ষা করতে হবে।
৪. নমুনায়িত চিংড়ি-গুলির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে। চিংড়ির এন্টিনা (দাঁড়ি গোঁফ), রোস্ট্রাম (করাত), লেজ, ফুলকা এবং সাতার পাঁ অঞ্চল ভালোভাবে দেখতে হবে। এসব এলাকা কালো হয়ে যাচ্ছে কিনা বা দাঁড়ি গোঁফ পচন ধরছে কিনা ইত্যাদি দেখতে হবে। এভাবে ১৫ দিন অন্তর অন্তর নমুনা পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

গলদা চিংড়ি আহরণ ও বাজারজাতকরণ

গলদা চিংড়ি সাধারণতঃ ৮-১০ মাসের মধ্যেই বাজারজাতকরণ আকৃতিতে পৌঁছায়। সকল চিংড়ি একই সময় বাজারজাত আকৃতিতে পৌঁছায় না। তাই ব্যবসায়িক দিক থেকে লাভবান হতে হলে যেগুলি বাজারজাতকরণের উপযোগী হয়েছে সেগুলো বাজারজাতকরণ করাই উত্তম এবং পর্যায়ক্রমে বাজারজাতকরণ করতে হবে। গলদা চিংড়ি যেহেতু রপ্তানীযোগ্য পণ্য তাই বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

চিংড়ি আহরণের উপকরণঃ

চিংড়ি সাধারণতঃ বেড় জাল, বাঁকি জাল দিয়ে আহরণ করা হয়ে থাকে। তবে বৎসর শেষে পাম্প দিয়ে ড্রেন গুঁকিয়ে চিংড়ি আহরণ করা উত্তম।

আহরণের পর করণীয়ঃ

আহরণের পর দ্রুত বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা করতে হবে। সে ক্ষেত্রে চিংড়ি আহরণ করার পর পরিষ্কার পানি দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে নিতে হবে এবং সেগুলো ছায়াযুক্ত স্থানে রাখতে হবে। স্থানীয় বাজারে এগুলো বাজারজাত করা যেতে পারে। তবে দূরে বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে বরফ দিয়ে সংরক্ষণ করে পরিবহণের ব্যবস্থা করতে হবে। বর্তমানে চিংড়ি বাজারজাতকরণ দুইভাবে করা যায়। মাথাসহ পদ্ধতি ও মাথা ছাড়া পদ্ধতি। তবে মাথা ছাড়ানোর ক্ষেত্রে ভালো অভিজ্ঞতা না থাকলে না ছাড়ানোই উত্তম।

চিংড়ির রোগ ব্যবস্থাপনা

সমন্বিত চিংড়ি চাষ বিষয়ক এই সহায়িকাটিতে উল্লেখিত জমি জ্বন্তত, রেণু মজুদ, নিয়মিত খাদ্য প্রয়োগ ইত্যাদি বিভিন্ন পদক্ষেপসহ অন্যান্য ব্যবস্থাপনা গুরুত্ব সহকারে অনুসরণ করলে সাধারণত চিংড়ির রোগ বালাই হওয়ার সম্ভাবনা থাকেনা। তথাপি যদি চিংড়ির রোগ বালাই দেখা দেয় তবে একজন চাষী ভাই যেন সে মুহূর্তে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে সেটা বিবেচনা করে নিম্নে রোগ বালাই ও প্রতিকার সম্বন্ধে আলোচনা করা হলোঃ

রোগ হচ্ছে এমন এক অস্বাভাবিক অবস্থা যা কতিপয় লক্ষণ দ্বারা বুঝা যায়। চিংড়ি একটি খোলস বিশিষ্ট জলজ অমেরুদণ্ডী প্রাণী এবং বিভিন্ন কারণে অনেক সময় পানিতে প্রতিকূল অবস্থায় তাকে বসবাস করতে হয়। তাই চিংড়ির রোগ হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

রোগ সৃষ্টির তিনটি প্রধান বিষয় হচ্ছেঃ

১. রোগ সৃষ্টিকারী জীব (প্যাথোজেন)
২. পরিবেশিক প্রতিকূলতা এবং
৩. চিংড়ি / মাছ নিজে

চিংড়ির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অন্যান্য অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের চেয়ে কম, তাই চিংড়িতে রোগ বেশী হয়।

পরিবেশ ⇒ রোগ বালাই ⇔ (চিংড়ি) ⇔ রোগ সৃষ্টিকারী জীবানু

যেদের পরিবেশ যখন রোগ জীবানুসহ ভারসাম্য অবস্থায় বসবাস করে তখন সাধারণতঃ চিংড়ির কোন রোগ বালাই হয় না। যদি কোন কারণে দুর্বল / পীড়িত হয়ে পড়ে তখন সহজেই রোগ জীবানু দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং পরবর্তীতে অসুস্থ হয়ে পড়ে। যেদের সার্বিক পরিবেশ ভালো থাকলে সাধারণতঃ চিংড়ির কোন রোগ বালাই হয় না।

একটি স্বাভাবিক রোগমুক্ত চিংড়ি দেখতে কি রকম দেখায় ?

- ♥ পাণ্ডলি দেখতে পরিষ্কার এবং সম্পূর্ণ।
- ♥ শরীর পরিষ্কার এবং চকচকে ও সম্পূর্ণ।
- ♥ খোলস নরম নহে এবং সহজে ভেঙ্গে যাবে না।
- ♥ ফুলকা পরিষ্কার এবং স্বাভাবিক রংয়ের।

রোগের সাধারণ লক্ষণঃ

মাসে একবার জাল টেনে মাছ ও চিংড়ির স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ করে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। পুকুরে ঘন ঘন জাল টানা ঠিক না। পুকুরে একবার জাল টানলে মাছ ও চিংড়ির যে ক্ষতি হয় তা পূরণ করতে এক দুই দিন সময় লাগে।

রোগের সাধারণ লক্ষণগুলো হলো নিম্নরূপঃ

- ♥ মাছ ও চিংড়ির সাধারণ চলাফেরা বন্ধ হয়ে যায়।
- ♥ মাছ ও চিংড়ি পানির উপরে ভেসে থাকি খায়।
- ♥ চিংড়ি পানির উপরে চলে আসার চেষ্টা করে।
- ♥ ফুলকার স্বাভাবিক রং কালো হয়ে যায়।
- ♥ দেহের উপর লাল/কালো/সাদা দাহ পড়ে।
- ♥ চিংড়ির খোলসের উপর সবুজ শেওলার স্তর পড়ে।
- ♥ চিংড়ির হাটার অঙ্গ এবং এন্টেনা (দাঁড়ি) খসে পড়ে অথবা আঁকা বাঁকা হয়ে যায়।
- ♥ চিংড়ির খোলস নরম হয়ে যায়।

রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে চিংড়ি ও মাছের বাহ্যিক অবস্থা এবং পুকুরের পরিবেশের প্রতি অত্যন্ত ভালোভাবে নজর রাখা উচিত।

গলদা চিংড়ির কয়েকটি সাধারণ রোগ

চিংড়ির নরম খোলস ও স্পঞ্জের মত দেহঃ

কারণঃ পানিতে ক্যালসিয়াম কমে গেলে এ্যামুনিয়া ও তাপমাত্রা বেড়ে গেলে, পুষ্টিকর খাদ্য কমে হলে এবং পানির গুণাগুণ নষ্ট হয়ে গেলে এ রোগ হয়।

লক্ষণঃ চিংড়ির খোলস নরম হয়ে যায়, উপর থেকে চাপ দিলে নীচে ডেবে যায়।

প্রতিকারঃ

- ♥ মজুদ ঘনত্ব কমিয়ে পুকুরে অন্তত ৫০% পানি বদল।
- ♥ পুকুরে প্রতি মাসে চুন প্রয়োগ। (প্রতি একরে ১৫-২০ কেজি ডলমাইট কৃষি চুণ)
- ♥ পুকুরে সার ও খাদ্য প্রয়োগ নিয়ন্ত্রণ।

মাথায় ও ফুলকায় কালো দাগঃ

কারণঃ পুকুরে এ্যামুনিয়া ও লৌ হ বেড়ে গেলে এবং খাদ্যে ভিটামিন সি, ভিটামিন বি কমপ্লেক্স কমে গেলে চিংড়ি এ রোগে আক্রান্ত হয়।

লক্ষণঃ মাথা, ফুলকা, লেজ, এবং উদর খন্ডেও কালো দাহ দেখা যায়।

প্রতিকারঃ

- ♥ মজুদ ঘনত্ব হ্রাস, পানি বদল (৩০-৫০%)।
- ♥ চুণ প্রয়োগ (০.৫ কিলো/শতাংশ/প্রতিমাসে)।
- ♥ খাদ্যের সাথে ভিটামিন সি (০.০৩ মি.গ্রা./কেজি), ভিটামিন প্রিমিক্স (২৫ মিলি গ্রা./কেজি মিশিয়ে দেওয়া)।

চিংড়ির কালো ফুলকা রোগ ও ফুলকা পচন রোগঃ

চিংড়ি যখন আহোনলযোগ্য আকার ধারণ করে তখন তাদের ফুলকার উপর ও নীচে কালো দাগ দেখা যায়। ফলে তাদের ফুলকা পঁচে যায় এবং শ্বাস প্রশ্বাস কষ্ট হয়। অবশেষে চিংড়ি মারা যায় এবং বাজারে চিংড়ির দাম কম হয়।

কারণঃ পুকুরের তলদেশে অতিরিক্ত জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ কালো মাটি। মাটিতে হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাসের বিস্তৃতি। ফ্যাংগাস এর উপস্থিতি।

লক্ষণঃ ফুলকার রং কালো হয়ে যায় এবং ফুলকা পঁচে যায়।

প্রতিকারঃ

- ♥ পুকুরে পানি পরিবর্তন (৩০-৫০%)
- ♥ সম্ভব হলে আশ্রয়স্থল তুলেদিয়ে হররা টেনে গ্যাস অপসারণ করে দেয়া

♥ পুকুরে চিংড়ির ঘনত্ব কমিয়ে দেয়া। খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করা।

এন্টেনা পচন(দাঁড়ি মোচ পচনঃ)

কারণঃ জৈব পদার্থ (প্রাণী দেহ) পচনের ফলে সৃষ্ট ব্যাকটেরিয়া, দূষিত ও বিষাক্ত গ্যাস (এ্যামুনিয়া, হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস)।

লক্ষণঃ এন্টেনা পচে ক্রমে ক্রমে খাটো হয়ে যায়। এন্টেনাতে গিট গিট সৃষ্টি হয়।

প্রতিকারঃ

- ♥ বড় চিংড়ি ধরে ঘনত্ব কমাতে হবে।
- ♥ পানি পরিবর্তন, নতুন পানি প্রবেশ।
- ♥ প্রতি মাসে ২০-২৫ কেজি/একর হারে ডলমাইট বা ক্রফি চুন প্রয়োগ।
- ♥ শামুকের মাংস প্রয়োগ নিয়ন্ত্রণ। পিলেট জাতীয় খাদ্য প্রয়োগ।
- ♥ বিকলাঙ্গ রোগঃ

কারণঃ এ রোগের প্রধান কারণ পুষ্টিহীনতা খাদ্যে পুষ্টিকাক দ্রব্যের ঘাটতি। খাদ্যে ট্রেচ ইলিমেন্টের অভাব।

লক্ষণঃ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেমনঃ পা, রোস্ট্রাম বেকে যাওয়া।

প্রতিকারঃ

চিংড়ি ধরে ঘনত্ব কমানো।
প্রোটিন মিনারেল সমৃদ্ধ খাদ্য প্রয়োগ।

রোগ প্রতিরোধের সহজ পথগুলো হচ্ছে নিম্নরূপঃ

- ♥ পুকুর নিয়মিত শুকিয়ে পরিমিত মাত্রায় চুন প্রয়োগ।
- ♥ পুকুরের তলায় অতিরিক্ত কাদা অপসারণ।
- ♥ পুকুরে নিয়মিত সার প্রয়োগ প্রাকৃতিক খাদ্যের যোগান স্থিতিবস্থায় রাখা। প্রয়োজনের বেশী সার প্রয়োগ থেকে চাষীকে বিরত রাখুন।
- ♥ কোন অবস্থাতেই অতিরিক্ত পোনা মজুদ না করা।
- ♥ পুকুরের তলায় আশ্রয়স্থল সৃষ্টি করা।
- ♥ কোন অবস্থাতেই বেশী পরিমাণ খাদ্য প্রয়োগ না করা।
- ♥ পুকুরে কোন ক্ষতিকর দ্রব্য না ফেলা।
- ♥ চিংড়ির বয়স বাড়ার সাথে সাথে খাদ্যের পরিমাণ প্রয়োজন মত বাড়ানো। তাই প্রাকৃতিক খাদ্যের পাশাপাশি কিছু পরিমাণে সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করা।
- ♥ পুকুর পাড়ে বড় ধরণের গাছ-পালা না রাখা এবং পুকুরে আলো বাতাস পড়ার সুযোগ থাকা।
- ♥ অল্প পরিমাণে জলজ গাছ থাকা।
- ♥ চিংড়ির সাথে অল্প পরিমাণে কাতলা, সিলভার কার্প ও প্রাস কার্প ছাড়া।
- ♥ পানির গভীরতা ৬০-১০০ সেন্টিমিটারে রাখা।

চিংড়ি সম্পর্কে কিছু ভুল ধারণা

সাধারণতঃ কোন বিষয়ের গভীরে না ঢুকে অর্থাৎ বিষয়টি সম্পর্কে পুরোপুরি না জেনে উপর থেকে দেখেই আমরা অনেক সময় কিছু ভুল ধারণা নিয়ে বসে থাকি। তদ্রূপ গলদা চিংড়ি সম্পর্কেও আমাদের দেশের অনেক চাষী ভাইয়ের মধ্যে কিছু কিছু ভুল ধারণা কাজ করে। যা মাঠ পর্যায়ের চাষী ভাইদের সাথে আলোচনা করে বেরিয়ে এসেছে। গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত গলদা চিংড়ি সম্পর্কে এই সমস্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে চাষী ভাইদের সঠিক ও পরিষ্কার ধারণা থাকার প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করেই কিছু বিষয় তুলে ধরা হলোঃ

সমস্যা সমূহঃ

- ♥ পানিতে ভেসে উঠে / হাজল উঠা।
- ♥ সমস্ত চিংড়ি পানির এক কোণে এস উপস্থিত হয়।
- ♥ চিংড়ি হেঁটে হেঁটে চলে যায়।

উপরোক্ত দর্শ্যগুলো গ্রামাঞ্চলে অনেক চাষী ভাইদের মুখে মুখে প্রচলিত আছে যেমনঃ চিংড়ি হেঁটে হেঁটে চলে এবং এই জন্য কেউ কেউ চিংড়ির বড় দু'খানা পাও ভেঙ্গে দেন। কারণ হেঁটে নলে যাওয়া চিংড়ির বৈশিষ্ট্য নয়। বাস্তবতা হলো এই যে, কখনও কখনও দেখা যায় চিংড়িগুলো পানিতে থেকে পাড়ের দিকে চলে আসার চেষ্টা করছে বা পানি থেকে একটু উপরে মাটিতে উঠে গেছে। এক্ষেত্রে দোষটা চিংড়ির নয় বরং আমাদের। চিংড়ি সব সময় তারজন্য সহনশীল পরিষ্কার পরিবেশ পছন্দ করে যা কিনা মানুষ হিসেবে আমরাও করি। আমরা যেমন কোন দুর্গন্ধযুক্ত পরিবেশে বেশীক্ষণ থাকতে পারি না তেমনি চিংড়িও তার থাকার অনুপযোগী কোন স্থানে থাকতে চায় না। আর তখনই বাতাস থেকে অক্সিজেন নেয়ার চেষ্টা করে এবং মনে হয় চিংড়ি পুকুর থেকে উঠে চলে যাচ্ছে।

কি কি কারণে এমনটি ঘটেঃ

- ♥ যদি কোন কারণে পানির অক্সিজেন কমে যায়।
- ♥ যদি কোন কারণে পানি অতিরিক্ত খোলাটে হয়ে যায়।

- ♥ যদি পানিতে কিছু পঁচে নষ্ট হয়ে যায়।
- ♥ কীটনাশক বা বিষ জাতীয় কিছু পানিতে মিশলে।

উপরের কারণগুলোর জন্যেই চিংড়ির ক্ষেত্রে উল্লেখিত সমস্যাগুলো ঘটে, তবে মূলতঃ অক্সিজেনে স্বল্পতাই এর জন্য দায়ী। পানিতে অন্যান্য সমস্যা না থাকলেও মেঘলা দিনে ঘোমট আবহাওয়া এমনিতেই পানিতে অক্সিজেনের অভাব দেখা দেয় এবং তখনও "চিংড়ি পানিতে খাবি খাচ্ছে" (ভেসে উঠা) এমন দৃশ্য চোখে পড়ে। মেঘলা দিনে এমনিতেই বাতাসের চাপ কম থাকে তার উপর প্রচলিত নিয়ম অনুসারে পানি নড়াচড়া করা হয় বা পানিতে ঢেউ সৃষ্টি করা হয় যার ফলে পানিতে অক্সিজেন বৃদ্ধির পরিবর্তে আরো কমে যায়। তাছাড়াও পানিতে থাকা ব্যাকটেরিয়াগুলো পানি থেকে প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন গ্রহণ করে ফলে চিংড়ির অক্সিজেন ঘাটতি দেখা দেয়।

করণীয়ঃ

- ♥ শতাংশ প্রতি ২৫০ গ্রাঃ করে চুন প্রয়োগ, যা অন্যান্য উপকারীতার পাশাপাশি ব্যাকটেরিয়াগুলোকে নিষ্ক্রিয় করে দেয় ফলে ব্যাকটেরিয়াগুলো পানি থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করতে পারে না।
- ♥ মেঘলা দিনের ঘোমট আবহাওয়ার সময় পানিতে কখনও ঢেউ সৃষ্টি করা যাবে না।
- ♥ অতিরিক্ত খাদ্য পানিতে পঁচে পানি নষ্ট করবে এমন কিছু পানিতে ফেলা যাবে না।
- ♥ সম্বনিত চিংড়ি চাষের জমিতে (ধান বা সজিতে) কীটনাশক বা বিষ জাতীয় কিছু প্রয়োগ করা যাবে না। আর ধানক্ষেতে মাছ বা চিংড়ি থাকলে বিষ প্রয়োগের প্রয়োজন পড়ে না যা মাঠ পর্যায়ে পরীক্ষিতভাবে প্রমাণিত।

Copyright information © agrobangla .com